ইঁদুরের প্রজাতি, ক্ষতির ধরণ ও সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

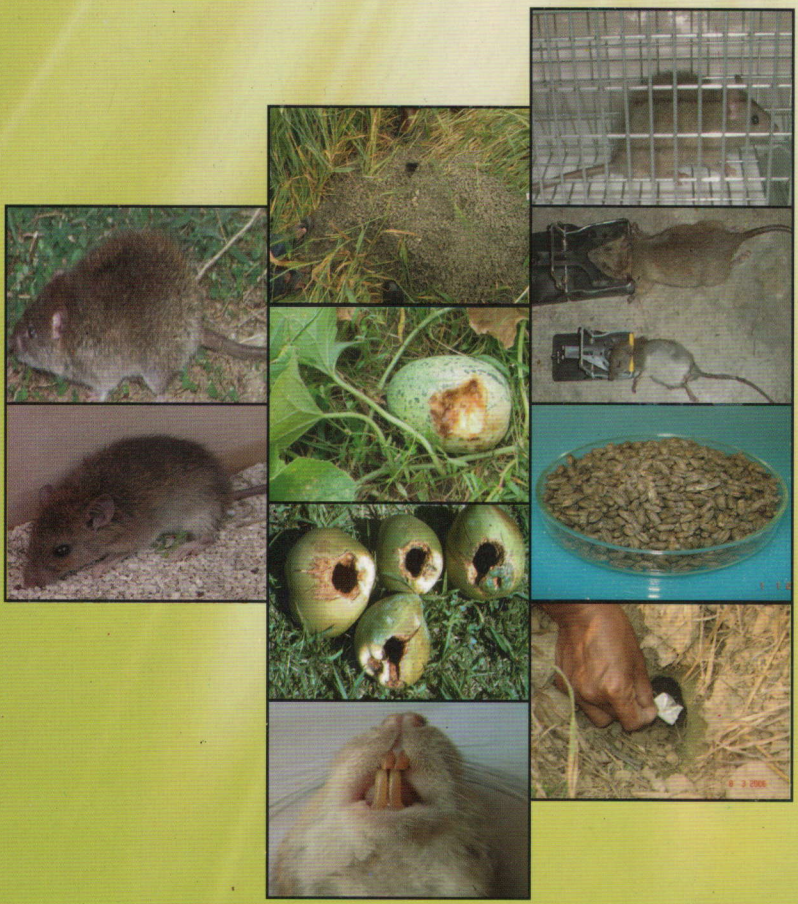

অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণী বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

ইঁদুরের প্রজাতি, ক্ষতির ধরণ ও সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণী বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

প্রকাশকাল
জুন, ২০১৬

প্রকাশনায়
অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণী বিভাগ
বারি, গাজীপুর -১৭০১

অর্থায়নে
বারি গবেষণা ও গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ণ ও সম্প্রসারণ প্রকল্প

রচনায়
ড. গোবিন্দ চন্দ্র বিশ্বাস, পিএস ও
ড. মোঃ শাহ আলম, এস এস ও
ড. আবু তৈয়ব মুহ. হাসানুজ্জামান, এস এস ও
ড. মোঃ ইমদাদুল হক, প্রাক্তন সি এস ও
মোঃ আনোয়ার জাহিদ, এস এস ও
মোহাম্মদ আরিফুর রহমান , এস এস ও
মোস্তাক আহমেদ, এস ও

কম্পিউটার গ্রাফিকস
মালেক'স, গাজীপুর ।

মুদ্রণে
স্ট্যান্ডার্ড প্রিন্টিং প্রেস
জয়দেবপুর বাজার, গাজীপুর-১৭০০
০১৭১২৪২৭৭২৯

মুখবন্ধ

ক্ষতিকর মেরুদন্ডী প্রানীর মধ্যে ইঁদুর মাঠ ফসল উৎপাদন ও গুদামজাত শস্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি প্রধান সমস্যা। ইঁদুর মাঠ ফসল ও গুদামে গর্ত করে, ফসল কেটে, খেয়ে, গর্তে নিয়ে, গুদামে খেয়ে, পায়খানা প্রশ্রাব ও পশম, মাটি ও শস্যের সাথে মিশিয়ে ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। ফসল ছাড়াও ইঁদুর বই পুস্তক, কাপড় চোপড়, আসবাবপত্র, রাস্তাঘাট বৈদ্যুতিক ও টেলিফোনের তার, বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ ইত্যাদির ক্ষতি সাধন করে থাকে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১৮ প্রজাতির ক্ষতিকর ইঁদুর সনাক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে মাঠের কালো ইঁদুর এবং গেঁছো ইঁদুর সব থেকে বেশী ক্ষতি করে থাকে। ইঁদুর গম ফসলে শতকরা ৪-১২ ভাগ, ধানে শতকরা ২-৪ ভাগ, গুদামে শতকরা ৫-৮ ভাগ, আলুতে শতকরা ৪-৫ ভাগ, আনারসে শতকরা ৫-৬ ভাগ ক্ষতি করে থাকে। তাছাড়া ইঁদুর পোলট্রি খামারেও ক্ষতি করে থাকে। ইঁদুর দানাদার শস্যের (ধান ও গম) বৎসরে প্রায় ৭২৪ কোটি টাকা ক্ষতি করে থাকে। এ ছাড়াও ইঁদুর র‍্যাট বাইট ফিভার সালমোনেলোসিস, খাদ্যে বিষক্রিয়া সহ প্রায় ৪০ প্রকার রোগ বিস্তার করে থাকে। তাই নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভবন করে ইঁদুর দমন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। ইঁদুর দমনের মাধ্যমে এদেশে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন করে বিদেশে রপ্তানী করা সম্ভব।

ইঁদুরের ক্ষয় ক্ষতি ও সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনার উপর একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। পুস্তিকাটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ছাত্র ছাত্রী, কৃষিবিদ, গবেষক, কৃষি সম্প্রসারণবিদ ও কৃষকদের বিশেষ প্রয়োজনে লাগবে বলে আমি বিশ্বাস করি। পুস্তকটির লেখক ও প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম মন্ডল)
মহাপরিচালক

প্রসঙ্গ কথা

ইঁদুর স্তন্যপায়ী, সর্বভূক, নিশাচর, মেরুদন্ডী প্রাণী। ইঁদুর মানুষের পরম অনিষ্টকারী প্রাণী এবং জাতীয় শত্রু। এরা মানুষের আশে পাশে থেকে প্রতিনিয়ত ক্ষতি করে চলেছে। ইঁদুর দানাদার শস্যে (ধন ও গম) বৎসরে প্রায় ৭২৪ কোটি টাকার ক্ষতি করে থাকে। তাছাড়া ইঁদুর নারিকেলসহ বিভিন্ন ফল, সবজি, গুদামজাত ফসল, মুরগির খামারেও ক্ষতি করে থাকে। ফসল ছাড়াও ইঁদুর বই পুস্তক, কাপড় চোপড়, আসবাবপত্র, রাস্তাঘাট, সেচনালা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, টেলিফোনে তার ও বৈদ্যুতিক তার কেটে ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। তাছাড়া ইঁদুর প্লেগসহ প্রায় ৪০ প্রকার রোগ বিস্তার করে থাকে। তাই ইঁদুর দমন করা অত্যন্ত জরুরী। ইঁদুর দমনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে এদেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব।

ইঁদুরের ক্ষয়ক্ষতি ও দমন ব্যবস্থার উপর লিখিত পুস্তিকাটি তাই অত্যন্ত সময় উপযোগী। পুস্তিকাটি কৃষকদের ইঁদুরের ক্ষতি ও দমন সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করবে এবং বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণবিদ, প্রশিক্ষণার্থী, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপকারে আসবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি। পুস্তিকাটির প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

ড. গোবিন্দ চন্দ্র বিশ্বাস
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান
অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণী বিভাগ

ইঁদুরের প্রজাতি, ক্ষতির ধরণ ও সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

ভূমিকাঃ

ইঁদুর স্তন্যপায়ী, সর্বভুক ও নিশাচর প্রাণী। কৃষি প্রধান বাংলাদেশে ফসলের জন্য ক্ষতিকর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে ইঁদুর মানুষের প্রধান শত্রু। ইঁদুর মানুষের উপকারে আসে এমন ঘটনা বিরল। মানুষের আশেপাশে থেকেই এরা মাঠে, গুদামে, বাসাবাড়িতে, অফিস-আদালতে প্রতিনিয়ত ক্ষতি করে চলেছে। পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নেই যেখানে ইঁদুরের সমস্যা নেই। এদের উপদ্রবে পৃথিবীর বহুদেশে চরম দূর্যোগ নেমে এসেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (১৯৬৭) হিসাব মতে, ইঁদুর প্রতি বছর বিশ্বের ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ টন খাবার নষ্ট করে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বহুদেশে এদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ণীত হয়েছে। বিশ্বে প্রতি বছর ইঁদুর যে পরিমান খাবার নষ্ট করে, সে খাবার খেয়ে অনায়াসেই ২৫-৩০ টি দরিদ্র দেশের মানুষ এক বছর বাচঁতে পারে। বাংলাদেশে প্রতিবছর ইঁদুরের কারনে গড়ে ৫০০ কোটি টাকারও বেশী ফসলের ক্ষতি হয়ে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ইঁদুর প্রায় ৭২৪ কোটি টাকার ফসলের ক্ষতি করেছে (দৈনিক প্রথম আলো ২২জুন ২০১৫)। কৃষি সংস্থা ইউ এসডিএ-এর ২০১০ সালের বিশ্বব্যাপী ইঁদুরের ক্ষতি করা নিয়ে গবেষণায় বলা হয়েছে ইঁদুর এশিয়ায় বছরে ১৮ কোটি মানুষের ১২ মাসের খাবার নষ্ট করে। বাংলাদেশে প্রায় ৮-১০ শতাংশ ধান ও গম ইঁদুর নষ্ট করে যা ৫০-৫৪ লক্ষ লোকের এক বছরের খাবারের সমান। ইঁদুর বছরে আমন ধানের শতকরা ৫-৭ ভাগ, গমের শতকরা ৪-১২ ভাগ, গোলআলুর শতকরা ৫-৭ ভাগ, আনারসের শতকরা ৬-৯ ভাগ নষ্ট করে । ইঁদুর শুধুমাত্র গম ফসলে বৎসরে প্রায় ৭৭,০০০ মেট্রিকটন ক্ষতি করে যার অনুমানিক মূল্য প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। ইঁদুর দ্বারা বছরে ফসল ও অন্যান্য জিনিসপত্রের প্রায় ১.৫-২.০ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়। তাছাড়াও ইঁদুর প্লেগসহ প্রায় ৪০ প্রকার রোগ ছড়ায়। শস্যহানি, রোগ-জীবাণূ ছড়ানো ছাড়াও ইঁদুর বই পুস্তক, কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র, রাস্তাঘাট, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নষ্ট করে থাকে। টেলিফোনের তার ও বৈদ্যুতিক তার কেটে যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল ও ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটায়। এ কথা অনস্বীকার্য যে, পোকা-মাকড়, রোগ-বালাই থেকে ইঁদুর অনেক বেশি ক্ষতি করে। শুধু ইঁদুরের হাত থেকে ফসল বাঁচাতে পারলে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে বিদেশে খাদ্য রপ্তানি করতে পারতো।

ইঁদুরের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও প্রজাতি

প্রাণী বিদ্যাগত শ্রেণীবিন্যাস হিসাবে ইঁদুরের শ্রেণী Mamalia, বর্গ Rodentia, গোত্র বা পরিবার Muridae, গণ *Rattus, Bendicota* ইত্যাদি এবং প্রজাতি *bengalensis, rattus* ইত্যাদি। পৃথিবীতে ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর প্রায় ১৭০০ প্রজাতি বিদ্যমাণ। এর মধ্যে মাত্র ২০-২৫ টি প্রজাতি আপদ বালাই বা অনিষ্টকারী হিসেবে চিহ্নিত। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১৮ প্রজাতির ইঁদুর সনাক্ত করা হয়েছে এবং এদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এরা সাধারণত গর্তে বাস করে, তবে কোনো কোনো প্রজাতির ইঁদুর ঘরে বা গাছে বাসা তৈরি করে বাস করে। ইঁদুর যে কোনো পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে খুব দ্রুত বংশ বিস্তার করতে সক্ষম। এ জাতীয় প্রাণী সমূহের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের দাঁতের গঠন ও বিন্যাস। এদের উভয় পাটিতে

সামনে এক জোড়া ছেদন দন্ত (Incisor) থাকে। যা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও ধারাল বাটালীর মত। এ ছেদন দাঁত জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বাড়তে থাকে। তাই ইঁদুর দাঁত বৃদ্ধির সমতা রাখার জন্য বা দাঁত ক্ষয় করার জন্য অনবরত কাটাকুটি করে বা গর্ত খোড়াখুড়ি করতে থাকে। বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রজাতির ইঁদুর, তাদের গঠনগত বৈশিষ্ট্য এবং আচরণ নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

মাঠের কালো ইঁদুর বা ছোট ব্যান্ডিকুট ইঁদুর *(Bandicota bengalensis)*

মাঠের কালো ইঁদুর (Lesser bandicoot rat), মাঠ ফসলে সব চেয়ে বেশী ক্ষতি করে থাকে। এরা মাঝারি আকৃতির, ওজন প্রায় ১৫০-৩৫০ গ্রাম, পশম কালো ধুসর রঙের। মাথা ও শরীরের মোট দৈর্ঘ্যের তুলনায় লেজ কিছুটা খাটো (চিত্র-১)। এরা সাতারে পটু। লম্বায় ৭.৫-২৫ সেমি.। এরা গর্ত তৈরী করে বসবাস করে। গর্ত ৮-১০ মিটার লম্বা ৭০ সেমি: পর্যন্ত গভীর এবং ৭-৮ সেঃ মিঃ ব্যাস বিশিষ্ট হয়ে থাকে। স্ত্রী ইঁদুরের সাধারনত ৮-১০ জোড়া স্তন থাকে। গর্ভধারন কাল ২১-২২ দিন। এরা সারাবছরই বাঁচ্চা জন্ম দিতে পারে, তবে বছরে ৫-৭ বার এবং প্রতিবারে ৬-১০ টি বাঁচ্চা জন্ম দিয়ে থাকে। এদের ১৪-১৮ দিনে চোখ ফোটে। ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত স্তন পান করে এবং তিন সপ্তাহ পর থেকে শক্ত খাবার খাওয়া শুরু করে। এদের বয়স তিন মাস পূর্ণ হলে বাঁচ্চা দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে।

বিস্তৃতিঃ

এ জাতীয় ইঁদুর সমগ্র উপমহাদেশ, বার্মা, সুমাত্রা ও জাভা পর্যন্ত দেখা যায়। বাংলাদেশের বনাঞ্চল ব্যতীত সর্বত্রই এদের বিস্তৃতি। সব রকমের কৃষিজাত ফসলেই এদের পাওয়া যায়। এছাড়া শহর এলাকা, ঘর বাড়ী এবং গুদামেও এদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

আচরণ ও স্বভাব ঃ

এ জাতীয় ইঁদুর সাধারণত গাছ, ছাদ, বা অন্য কোন উঁচু স্থানে উঠতে পারে না। তবে গর্ত করতে খুবই পারদর্শী। গর্তের মুখে মাটির ঢিবি তৈরী এদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এরা বেশ ভাল সাঁতার কাটতে পারে। বন্যার সময় এ ইঁদুরকে পানিতে যেমন ভাসা আমন ধানে, কচুরীপানার ভিতরে বাসা তৈরী করে বসবাস করতে দেখা যায়। অনেক সময় এরা কুশি কেটে চলাচলের পথ তৈরী করে। এরা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী খাদ্যশস্য গর্তে মজুত করে থাকে। একটি গর্ত থেকে ১০ কিলোগ্রাম ধান পাওয়ার উদাহরণ আছে। সাধারণত একটি পূর্ণ বয়স্ক ইঁদুর একটি গর্তে বাস করে। এ জাতীয় ইঁদুর গর্ত থেকে খুব বেশী দূরে যায় না। একটি ইঁদুরের বাসায় গর্তের সংখ্যা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে এবং একটি ইঁদুর এক রাত্রের মধ্যে নতুন স্থানে নতুন গর্ত তৈরী করতে পারে। এ জাতীয় ইঁদুর গম ও আমন ধান কাটার সময় (মার্চ ও নভেম্বর) বেশী বাচ্চা দেয়। এ প্রজাতির ইঁদুর প্রায় সব সময়ই সক্রিয় দেখা যায় তবে খুব ভোরে ও সন্ধ্যার সময় এরা অত্যন্ত সক্রিয় থাকে। এদেরকে উত্তেজিত করলে গায়ের লোম খাড়া করে এবং হিংস্র ভাব প্রকাশ করে শো শো শব্দ করতে থাকে।

ক্ষতিকর ভূমিকাঃ

মাঠের কাল ইঁদুর কৃষি ফসলের সবচেয়ে বেশী অনিষ্টকারী প্রাণী। ফলগাছ ছাড়া সকল ধরনের কৃষিজাত ফসলে এরা প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করে ক্ষতি করে থাকে। এরা গর্ত তৈরীর ব্যাপারে সক্রিয় যার ফলে বীজতলা ও ফসলের চারা অবস্থায় খুবই ক্ষতি হয়ে থাকে। ইঁদুর মাঠ ও গুদামে উভয় স্থানেই গর্ত করে, ফসল কেটে, খেয়ে, গর্তে নিয়ে, গুদামে খেয়ে, পায়খানা প্রশ্রাব ও পশম, মাটি ও শস্যের সাথে মিশিয়ে ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। এ ছাড়া রাস্তাঘাট, পানি সেঁচের নালা, বাঁধ এবং ঘর বাড়ীর যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে। সবচেয়ে আশংকাজনক ব্যাপার হল যে এ প্রজাতির একটি ইঁদুর এক রাত্রে ২০০-৩০০ টি ধান বা গমের কুশি কাটতে পারে।

মাঠের বড় কালো ইঁদুর বা বড় ব্যান্ডিকুট ইঁদুর (Greater bandicoot rat, *Bandicota indica*)

এদের দেখতে মাঠের কাল ইঁদুরের ন্যায়। কিন্তু তাদের চেয়ে আকারে বেশ বড়, মুখাকৃতি সরু, ৩৫০-১০০০ গ্রাম ওজনের হয়ে থাকে। পিছনের পা বেশ বড় এবং কাল হয় বলে সহজেই চেনা যায়। মাথা ও দেহের দৈর্ঘ্য ১৫-৩০ সে:মি:। এ ইঁদুরের রং কালচে ধুসর বা তামাটে বর্ণের। মাথা ও শরীরের মোট দৈর্ঘ্যের তুলনায় লেজ কিছুটা খাটো। লেজ বেশ মোটা, লেজের রিং গুলো স্পষ্ট, পিছনের পা বড়, চওড়া ও পায়ের পাতার নিচের দিকে কালো (চিত্র-২)। এরা সাতারে পটু, গর্তে বাস করে, গর্ত ৮-১০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এরা বছরে ৫-৭ বার এবং প্রতিবারে ৮-১০ টি বাঁচ্চা জন্ম দিতে পারে। এদের গর্ভধারন কাল ২১-২৫ দিন, ১৮-২২ দিনে বাঁচ্চার চোখ ফোটে এবং ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত স্তন পান করে স্তন সাধারনত ৬ জোড়া। বাঁচ্চাদের বয়স ৩ মাস পূর্ণ হলেই বাঁচ্চা জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। এরা সাধারণত মাঠে ধান ফসলের বেশী ক্ষতি করে।

চিত্র-১ : মাঠের কালো ইঁদুর *B. bengalensis*

চিত্র-২ : মাঠের বড় কালো ইঁদুর *B. indica*

বিস্তৃতি ও স্বভাবঃ

বাংলাদেশের সব নীচু এলাকায় এদের পাওয়া যায়। তবে শুকনো মৌসুমে যে সমস্ত জায়গায় মাটিতে পানির ভাগ বেশী থাকে অর্থাৎ হাওড়, বিল এলাকায় বেশী পাওয়া যায়। সাধারণত: ঘর বাড়ীতে দেখা যায় না। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূল, দ্বীপ যেমন নিঝুম দ্বীপ এবং মনপুরায় এই ইঁদুর বেশী পাওয়া যায়। এরা সাঁতারে পটু, হিংস্র স্বভাবের উত্তেজিত হলে লেজ খাড়া করে গো গো শব্দ করে। দ্বীপ, হাওড় ও বিল এলাকায় শুখনার সময় ভিজা মাটিতে গর্ত করে বাস করে।

ক্ষতিকর ভূমিকাঃ

এ প্রজাতির ইঁদুর যেখানে অবস্থান করে সেখানকার ফসল কেটে, খেয়ে, গর্তে নিয়ে প্রচুর ক্ষতি করে থাকে। তবে সাধারণতঃ আদ্র বীজতলা, ভাসা আমন ধানের বেশী ক্ষতি করে থাকে। গর্ত খুড়ে খাদ্যশস্য গর্তে জমা করে ফসলের বিপুল ক্ষতি সাধন করে থাকে। সাঁতার জানে বলে ভাসা আমন ধানের জমিতে বাসা বেধে ক্ষতি করতে পারে। এর দ্বারা দ্বীপে বনজ গাছ পালার বেশ ক্ষতি সাধিত হয়। বাংলাদেশে সিলেট জেলার হাওড় এলাকায় ফসলে এরা বেশী ক্ষতি করে থাকে।

গেঁছো ইঁদুর বা ঘরের ইঁদুর (House/ roof rat, *Rattus rattus*)

গেঁছো ইঁদুর সাধারণতঃ মাঝারী ধরনের, লম্বাটে, লালচে বাদামী বর্ণের হয়ে থাকে। শরীরের নীচের দিকটা সাদাটে বা হালকা মরিচা হলুদ বর্ণের। এদের পশম নরম এবং পিছনের দিকে কিছু কিছু পশম অন্যান্য পশমের চেয়ে লম্বা। দেহের দৈর্ঘ্য ৭-২২সেঃ মিঃ মাথা ও শরীরে মোট দৈর্ঘ্যের তুলনায় লেজ লম্বা (চিত্র-৩)। লেজের দৈর্ঘ্য৫-২৩ সেঃমিঃ লেজের সাহায্যে ভারসাম্য রক্ষা করে এক গাছ থেকে অন্যগাছে সহজেই চলাচল করতে পারে। এই জাতের ইঁদুর গুদাম জাত শস্য, ঘরে রাখা খাদ্যশস্য, ফলমূল, তরি তরকরী ইত্যাদির ক্ষতি সাধন করে থাকে। এরা মাটিতে গর্ত না করে ঘরের মাঁচায় বা গুপ্ত স্থানে গাছে বাসা তৈরী করে বংশ বৃদ্ধি করে। এদেরকে সাধারনতঃ মাঠে কম দেখা যায়, তবে বাড়ীর আশেপাশে, উচুঁ এলাকায় ও নারিকেল জাতীয় গাছে বেশী দেখা যায়। এরা সারাবছরই বাঁচ্চা দিতে পারে। সাধারনতঃ বছরের ৭/৮ বার ও প্রতিবারে ৩-৬ টি করে বাঁচ্চা প্রসব করে থাকে। এদের গর্ভধারনকাল ১৮-২১ দিন।

চিত্র-৩: গেঁছো ইঁদুর, *Rattus rattus*

চিত্র- ৪: ঘরের নেংটি ইঁদুর, *Mus musculus*

ছোট গেঁছো ইঁদুর (*Rattus exulans*)

ছোট গেঁছো ইঁদুর দেখতে অনেকটা বড় গেঁছো ইঁদুরের মতই। তবে কিছুটা লম্বাটে, লালচে বাদামী বর্ণের এবং আকারে বড় গেঁছো ইঁদুরের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে ছোট হয়ে থাকে (সাধারনতঃ ৫০-৭০ গ্রাম)। এদের পেটের পশম সাদাটে এবং লেজের দৈর্ঘ্য মাথা ও শরীরের তুলনায় লম্বা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ বছরে ৭/৮ বার এবং প্রতিবারে ৩-৬ টি করে বাঁচ্চা প্রসব করে থাকে। এদেরকে সাধারনতঃ মাঠে কম দেখা যায়, তবে বাড়ীর আশেপাশে, উচুঁ এলাকায় ও নারিকেল জাতীয় গাছে বেশী দেখা যায়। দেশের দক্ষিণ এলাকায় এদের বেশী দেখা যায়। এ জাতের ইঁদুর গুদাম জাত শস্য, ফলমূল, তরি তরকারী ইত্যাদির বিশেষ ক্ষতি সাধন করে।

ঘরের নেংটি ইঁদুর (House mouse, *Mus musculus*)

ছোট আকারের এই ইঁদুরকে কোন কোন এলাকায় ঘরের বাত্তি ইঁদুর, কোথাও শইল্লা ইঁদুর বলে থাকে। এ ইঁদুরের শরীর ও মাথার দৈর্ঘ্যের তুলনায় লেজের দৈর্ঘ্য কিছুটা বড় হয় (চিত্র-৪)। মাথা ও শরীরের মোট দৈর্ঘ্য ৩-১০ সে:মি: এবং এদের ওজন পূর্ন বয়স্ক অবস্থায় সাধারনত: ১৪-২০ গ্রাম হয়। গায়ের পশম ছাই বা হালকা তামাটে বর্ণের, পেটের পশম খানিকটা হালকা ধুসর বর্ণের। এরা ঘরে বাস করে, ঘরে সংরক্ষিত খাদ্যশষ্য, ঘরের জিনিস পত্র, কাপড় চোপড়,লেপ তোষক, বই পুস্তক, অফিস আদালত, বাসাবাড়ী, ল্যাবরেটরীর জিনিস পত্র, যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক তার ইত্যাদি কেটে ব্যাপকভাবে ক্ষতি সাধন করে। এরা সারা বছরই বাঁচ্চা জন্ম দিতে পারে তবে, সাধারনত: বছরে ৭-৮ বার এবং প্রতিবারে ৪-৬ টি বাঁচ্চা জন্ম দেয়। এদের গর্ভধারণ কাল ১৮-২১ দিন এবং স্ত্রী ইঁদুরের স্তন ৫ জোড়া। বাঁচ্চা প্রসবের ৪৮ ঘন্টা বা দুই দিনের মধ্যে স্ত্রী ইঁদুর পুনরায় গর্ভধারন করতে পারে। বাঁচ্চাদের বয়স দুই মাস পূর্ন হলেই বাঁচ্চা জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে।

মাঠের ছোট নেংটি ইঁদুর (*Mus booduga*)

ছোট আকারের ইঁদুর মাঠের নেংটি ইঁদুরের মতই। ইঁদুরের শরীর ও মাথার দৈর্ঘ্যের তুলনায় লেজের দৈর্ঘ্য কিছুটা বড় হয়। এরা সাধারনত মাঠে বাস করে। গায়ের উপরের দিকের পশম ধূসর ও পেটের দিক হালকা ধূসর বা সাদাটে ধূসর (চিত্র-৫)। পশম ছোট এবং খুবই মসৃণ। মাঠের ছোট দানাদার ফসলের ক্ষতি করে থাকে। এরা মাটিতে গর্ত করে বাস করে। এদের গর্ত খুব ছোট এবং চিকন। অনেক সময় পোকার গর্ত বলে মনে হয়। এরা সারা বছরই বাঁচ্চা জন্ম দিতে পারে। সাধারনত বছরে ৭-৮ বার এবং প্রতিবারে গড়ে ৪-৬ টি বাঁচ্চা দেয়। এদের গর্ভধারণকাল ১৮-২১ দিন এবং স্ত্রী ইঁদুরের স্তন ৫ জোড়া। বাঁচ্চা প্রসবের ৪৮ ঘন্টার বা দুই দিনের মধ্যে স্ত্রী ইঁদুর আবার গর্ভধারন ক্ষমতা অর্জন করে। বাঁচ্চাদের বয়স দুই মাস পূর্ন হলেই বাঁচ্চা জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে।

চিত্র-৫: মাঠের ছোট নেংটি ইঁদুর, *Mus booduga*

চিত্র-৬: ছোট পাহাড়ী ইঁদুরঃ *Cannomys badius*

ছোট পাহাড়ী ইঁদুরঃ (Bamboo Rat, *Cannomys badius (Hodgson)*

ছোট পাহাড়ী ইঁদুর বাংলাদেশসহ ভারত, নেপাল, মায়ানমার ও থাইল্যান্ডে দেখা যায়। এরা সাধারণত ঘাসযুক্ত জায়গায় বন জংগলে পাহাড়ের আবাদী জমিতে ও বাঁশের ঘন ঝোপ জংগলে, গর্ত করে বাস করে। এদের মাথাসহ শরীর লম্বায় ১৮- ২০ সে: মি: ও লেজ ৭ - ৮ সে: মি: মাথা

ও শরীর ঘন লোমে আবৃত (চিত্র-৬)। লেজে পশম অত্যন্ত পাতলা। কান ছোট বলে পশমে ঢেকে থাকে বা সামান্য দেখা যায়। গায়ের রঙ হাল্কা লাল থেকে বাদামী। এদের হাত, পা ও নখ ছোট কিন্তু খুবই শক্তিশালী। এরা দাঁত ও নখের সাহায্যে খুব তাড়াতাড়ি পাথুরে মাটিতেও গর্ত খুঁড়তে পারে। এদের দাঁত দেখতে লালচে হলুদ, চওড়া, শক্ত ও সামনে দিকে বাঁকানো। এদের মুখ থেবড়া, শরীরের গঠন খুবই মজবুত, মোটা ও চোখ ছোট। মাটির উপরে আস্তে আস্তে চলাফেরা করে, তবে শত্রুর আক্রমণে ভীত নয়। রাতে গর্ত থেকে বের হয়ে ঘাস, গাছের কচি কান্ড, আবাদী ফসল ইত্যাদি খায়। মাটির উপরের বা নিচের বাঁশের কচি অংশ খেয়ে ক্ষতি করে। বনজ গাছসহ চা ও রাবার গাছের শিকড় কেটেও যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে। এদেশের উপ-জাতীয়রা গর্ত খুড়ে বা ফাঁদ দিয়ে ধরে এদের মাংস খায়।

খাটো লেজযুক্ত ইঁদুরঃ (Short-tailed mole rat, *Nesokia indica (Gray)*

খাটো লেজযুক্ত ইঁদুর মাঝারী আকারের, দেখতে প্রায় ছোট ব্যান্ডিকুট ইঁদুরের মতো। তবে এদের শরীর মজবুত, খাটো ও মোটা। শরীরের দৈর্ঘ্যের তুলনায় লেজ বেশি খাটো বা দুই-তৃতীয়াংশ। এদের লেজে পশম না থাকায় খুবই মসৃণ দেখায়। সামনের কর্তন দন্তগুলো বাটালের মতো চ্যাপ্টা ও হলদে রঙের। মুখাকৃতি খাটো ও মোটা (চিত্র-৭)। এরা গর্ত করতে পারদর্শী এবং গর্তের মুখে অনেক মাটি জমা করে। গর্ত ৫০ মিটারের চেয়েও লম্বা হতে পারে। তবে গর্তে কোনো খাবার জমা করে না। গর্ত খুব লম্বা বলে গর্তের অনেকগুলো মুখ থাকে ও একই গর্তে একাধিক বাসাও দেখা যায়। একটি গর্তে সাধারণত একটি ইঁদুরই থাকে। গর্তের মুখে মাটির স্তূপ দেখে দূর থেকেই এ প্রজাতির ইঁদুর বলে ধারণা করা যায়। এ প্রজাতির ইঁদুর রাস্তার পাশে, ফসলের জমিতে, জমির আইলে, সেচ নালা ইত্যাদি স্থানে বসবাস করে। সাধারণত বছরে ৪ থেকে ৫ বার ও প্রতিবারে ২ থেকে ৬ টি করে বাচ্চা প্রসব করে। এদের গর্ভধারণকাল ২৬ থেকে ২৮ দিন। সারা বছরই বাচ্চা দেয় তবে নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত বাচ্চা দেয় খুব বেশি। রাত ছাড়াও সকালে এবং বিকালে বেশি সক্রিয় থাকে। সকল প্রকার ফসলের ক্ষতি করলেও কচি আখ গাছের গোড়া কেটে ও মূল জাতীয় ফসলের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি সাধন করে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এই প্রজাতির ইঁদুর সর্বাধিক দেখা যায়।

চিত্র-৭: খাটো লেজযুক্ত ইঁদুর, *Nesokia indica*

চিত্র-৮: মাঠের নেংটি ইঁদুর, *Mus terricolor*

মাঠের নেংটি ইঁদুর *(Mus terricolor)*

এ ইঁদুর ঘরের নেংটি ইঁদুরের চেয়েও আকারের ছোট এবং পুর্ন বয়স্ক অবস্থায় ওজন সাধারণত:

১০ গ্রামের নীচে হয়। এরা সাধারনত বাড়ীর আশেপাশে, সবজি ক্ষেতে ও মাঠে বাস করে, এ ইঁদুরের পিছনের পায়ের পশম এবং পেটের পশম গাঢ় ধূসর বর্ণের হয় এবং এদের লেজ ও মাথা ও শরীরের তুলনায় সামান্য লম্বা হয় (চিত্র-৮)। এরা সারা বছরই বাঁচ্চা জন্ম দিতে পারে। তবে,সাধারনত: বছরে ৭-৮ বার এবং প্রতিবারে ৪-৬ টি বাঁচ্চা জন্ম দেয়। এদের গর্ভধারণ কাল ১৮-২১ দিন এবং স্ত্রী ইঁদুরের স্তন ৫ জোড়া। বাঁচ্চা প্রসবের ৪৮ ঘন্টার বা দুই দিনের মধ্যে স্ত্রী ইঁদুর পুনরায় গর্ভধারন করতে পারে। বাঁচ্চাদের বয়স দুই মাস পূর্ন হলেই বাঁচ্চা জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে।

ইঁদুর বিভিন্ন ফসলে বিভিন্ন ভাবে ক্ষতি করে থাকে। এদের ক্ষতির ধরণ বা লক্ষণ নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

ধান ক্ষেতে ইঁদুরের ক্ষতির ধরণ

ইঁদুর ধান গাছের কান্ড সব সময়ই ৩০-৪৫ ডিগ্রী কোণে তেরছাভাবে কাটে যার ফলে কান্ড নুয়ে পড়ে (চিত্র-৯) অধিকাংশ সময়ই ইঁদুর মাটি থেকে প্রায় ১০ সে: মি: উপর থেকে কান্ড কেটে দেয়। কিন্তু ধান বা গমে যখন শীষ বের হয় তখন ইঁদুর কখনো কখনো উক্ত শীষকে বাঁকিয়ে নিয়ে শুধু শীষ কেটে দেয়। কোন কোন সময় ইঁদুর শুধু মাত্র তার দাঁতকে ধারালো এবং স্বাভাবিক রাখার জন্য অথবা বাসা তৈরী করার জন্য ধান কেটে টুকরো টুকরো করে থাকে এবং গর্তে জমা করে (চিত্র-১০)।

গভীর পানির ভাসা আমন ধানে থোর আসার পূর্ব থেকেই ইঁদুরের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত: বড় কালো ইঁদুর ভাসা আমন ধানে ক্ষতি করে থাকে। ইঁদুর গাছের কান্ডের যে অংশ হতে পাতা গজায় তার উপরি ভাগের ডাটার মাঝখানের ২ সেঃ মিঃ রস যুক্ত নরম অংশ খেয়ে ফেলে। ফসল কাটার সময় ধান ক্ষেতে অনুরূপ লক্ষণ দেখা যায়। ফলে ফলন অনেক কমে যায়। রোপা আমন ধানেও বেশী ক্ষতি করে থাকে।

চিত্র-৯: ইঁদুর দ্বারা তেরছা করে কাটা ধান গাছ

চিত্র-১০: ধান ক্ষেতে ইঁদুরের গর্ত ও ক্ষতির নমুনা

গম ক্ষেতে ইঁদুরের ক্ষতির ধরণ

গম উৎপাদনে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে ইঁদুর। গ্রামাঞ্চলে 'কথায় বলে ইঁদুর গমের যম'। বীজ গজানো থেকে শুরু করে গম কাটা পর্যন্ত মাঠে ইঁদুরের উপদ্রব দেখা যায়। ইঁদুর গম ফসলের অংগজ বৃদ্ধি অবস্থায় মাঠে প্রথমে গর্ত তৈরি করে। এবং নীচের মাটি উপরে উঠিয়ে জমা করে ডিবি তৈরী করে। পরবর্তী পর্যায়ে গর্তের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং মাটির ০.৫-১.০ ফুট নীচে দিয়ে গর্ত করে নালা তৈরী করে। অনেক গুলি নালা ও গর্তের মুখ সৃষ্টি হয় এই অবস্থাকে Burrow system বলে। এভাবে ক্ষেতে বহু সংখ্যক গর্ত, নালা ও প্রচুর পরিমানে মাটি উঠিয়ে গমক্ষেতে ব্যাপক ক্ষতি করে (চিত্র-১১)। তবে ইঁদুর শীষ বের হওয়া অবস্থায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করে থাকে। শীষ বের হওয়ার শুরু থেকে কুশি কেটে গাছের নরম অংশের রস খায় ও পরে গাছ কেটে ও গম খেয়ে ফসলের ক্ষতি করে। ইঁদুর গাছ কেটে গমসহ শীষ গর্তে নিয়েও প্রচুর ক্ষতি করে থাকে। একটি ইঁদুর এক রাতে ১০০-২০০ টি পর্যন্ত গমের কুশি কাটতে সক্ষম। গম ফসলের কান্ড ও শীষ কেটে গর্তে নিয়ে জমা করে এবং প্রচুর সংখ্যক কাটা শীষ এলোমেলো ভাবে পড়ে থাকতে দেখা যায় (চিত্র-১২)। ফলে গমের ফলন মারাত্মকভাবে কমে যায়। গমের শীষ বের হওয়ায় সময় থেকে গম আধা পরিপক্ক অবস্থা পর্যন্ত ক্ষতির মাত্রা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে রাজশাহী ও দিনাজপুর অঞ্চলে গম ক্ষেতে বেশী ক্ষতি করে থাকে। গবেষণায় দেখা যায় ছিটিয়ে বপন কৃত গমে ক্ষতির পরিমান সব থেকে বেশী হয়ে থাকে (শতকরা ১৫-২০ ভাগ)। সারিতে বপনকৃত গমে ক্ষতির পরিমান শতকরা ৮-১০ ভাগ। এবং বেড পদ্ধতিতে বপন করা গমে ক্ষতির পরিমান শতকরা ২-৩ ভাগ হয়ে থাকে।

চিত্র-১১: ইঁদুর দ্বারা তেরছা করে কাটা গম গাছ, গমের মাঠে ইঁদুরের গর্ত ও ক্ষতির নমুনা চিত্র

চিত্র-১২: ইঁদুরে ক্ষতিগ্রস্থ গম গাছ পর্যবেক্ষণ

চিত্র-১৩: ছিটিয়ে বোনা গম ক্ষেতে ইঁদুরের ক্ষতি

চিত্র–১৪:বার্লি ক্ষেতে ইঁদুরের গর্ত এবং মারাত্মক ক্ষতির নমুনা

চিত্র–১৫: মশুরের ক্ষেতে ইঁদুরের গর্ত ও ক্ষতির নমুনা

চিত্র–১৬: বেড পদ্ধতির গমে ইঁদুরের ক্ষতি নাই

ইঁদুর গমের মত বার্লি ও মসুর ক্ষেতেও গর্ত করে ও কেটে ক্ষতি করে (চিত্র- ১৪ ও ১৫)

ইক্ষুতে ইঁদুর দ্বারা ক্ষতির ধরণঃ

পশ্চিমাঞ্চলে বিভিন্ন ইক্ষু উৎপাদনকারী জেলায় মাঠের কাল ইঁদুর ছাড়াও নেসোকিয়া ইং-কা নামক ইঁদুর ইক্ষুর গোড়ার দিকে খেয়ে বেশ ক্ষতি করে থাকে। এ ইঁদুর গর্ত করে মাটির নীচে অবস্থান করে এবং শিকড় কেটে ইক্ষু গাছের ক্ষতি করে থাকে। প্রথম অবস্থায় কেবল গাছ টেনে তুললেই এর আক্রমণ দেখা যায়। আক্রমণের শেষ পর্যায়ে গাছ মারা যায়, যার ফলে গাছ দেখেই ইঁদুরের আক্রমণ বোঝা যায়। মাঠের কাল ইঁদুর ইক্ষু গাছের গোড়ার দিকে কেটে নষ্ট করে থাকে। তাছাড়া আখের গোড়ার দিকের অংশ কামড়িয়ে ক্ষতি সৃষ্টি করে ও চিবিয়ে খেয়ে ক্ষতি করে থাকে(চিত্র- ১৭)। কর্তিত আখ রোগাক্রান্ত হয়ে পঁচে নষ্ট হয়ে যায়। এভাবে ইঁদুর আখ ক্ষেতের ক্ষতি করে থাকে। বাংলাদেশে ঈশ্বরদী, পাবনা, কুষ্টিয়ায়, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে ইঁদুর আখের বেশী ক্ষতি করে থাকে।

চিত্র– ১৭: আখ ক্ষেত্রে গর্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ আখ।

ইঁদুর দ্বারা নারিকেলের ক্ষয় ক্ষতির নমুনা

সাধারনতঃ ফল গাছে গেছো ইঁদুর ক্ষতি করে থকে। এরা কিছুটা বাদামী বর্ণের। এরা নারিকেল গাছে উঠে বাসা তৈরী করে এবং কচি ডাবের অগ্রভাগে বোটার দিকে ছিদ্র করে ডাবের পানি ও শাস খেয়ে পুষ্টি গ্রহন করে ক্ষতি করে থাকে। ফলে ডাব ছিদ্র যুক্ত হয়ে যায় এবং গাছ থেকে মাটিতে পড়ে যায়। (চিত্র-১৮)। ফলে নারিকেল পরিপক্ক হতে পারেনা এবং ফলন অনেক কমে যায়। কখনও কখনও আঁধা পরিপক্ক নারিকেল ও বোটার/মাথার দিকে ছিদ্র করে শাঁস খায় ফলে নারিকেল ও ঝরে পড়ে। বাংলাদেশে দক্ষিন অঞ্চলে বরিশাল, খুলনায়, নারিকেলের বেশী ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়। সাধারনত জরীপে দেখা গেছে গড়ে বছরে গাছ প্রতি ৮ -১২ টি নারিকেল ইঁদুর দ্বারা ক্ষতি বা নষ্ট হয় যার আনুমানিক মূল্য ২৫০-৪০০ টাকা। প্রায়ই দেখা যায় গেছো ইঁদুর নারিকেল গাছের মাথায় কচি পাতা ও ডগা কেটে বাসা তৈরী করে ফলে নারিকেল গাছ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং নারিকেলের সংখ্যা ও ফলন কমে যায়। এভাবে ইঁদুর নারিকেল গাছ ও নারিকেলের ক্ষতি বা নষ্ট করে থাকে। তাই এদের দমন করা অত্যন্ত জরুরী।

চিত্র-১৮: ইঁদুর দ্বারা ডাবের ক্ষতি

চিত্র-১৯: ইঁদুর দ্বারা আনারসের ক্ষতি

আনারসে ইঁদুর দ্বারা ক্ষতির ধরণঃ

দুই ধরনের ইঁদুর এবং কোন কোন সময় কাঠবিড়ালী আনারসের ক্ষতি করে থাকে। সাধারণত: আনারসের নীচের দিকে যেখান থেকে পাকা আরম্ভ করে সেখান থেকে ২-৩ ব্যসার্ধের বাঁকানো গর্ত করে আনারসের ক্ষতি করে থাকে (চিত্র-১৯) । ইঁদুর কোন কোনে সময় চিবিয়ে আনারসের ক্ষতি করে থাকে। ফল বাজারে এর দাম কমে যায় এবং এই আক্রমণের ফলে আনারসের ছত্রাক রোগ হয়ে পচে নষ্ট হয়। এভাবে আনারসে প্রায় শতকরা ৬ ভাগ ক্ষতি করে থাকে।

আলু ও মিষ্টিআলুতে ইঁদুরের ক্ষতির ধরণঃ

গোল আলুর ক্ষেতে গাছের অংগজ বৃদ্ধির সময় ইঁদুর প্রথমে মাঠে ২/১ টি গর্ত করে মাটি উপরে উঠিয়ে ক্ষতি করে থাকে। ইঁদুর আলুর মাটির উপরের কান্ড ও ডগা কেটে দেয়। আলু ধরার সময় ইঁদুর গাছের শিকড় কেটে দেয়। তার পর আলু যখন বড় হয় তখন ইঁদুর মাটির নীচের আলু গর্ত করে খেয়ে ও ক্ষতি করে থাকে (চিত্র-২০)। সাধারণত ইঁদুর আলুর শতকরা ৫-৭ ভাগ ক্ষতি করে থাকে। মিষ্টিআলুর ক্ষেতে ইঁদুরের আক্রমণ আলু থেকে বেশী দেখা যায়। মিষ্টি আলুর ক্ষেত লতায় ঢেকে যায় ফলে ইঁদুর প্রচুর সংখ্যক গর্ত করে ডগা ও লতা কেটে গর্তে নিয়ে যায়। ক্ষেতে গর্ত

করে মাটির ঢিবি তৈরি করে। অর্ধ পরিপক্ক মিষ্টিআলু কামড়িয়ে খেয়ে ক্ষত সৃষ্টি করে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি করে থাকে (চিত্র-২১)। ফলে মিষ্টিআলুর ফলন কমে যায়। সাধারণত ফল, সবজি, চীনাবাদাম ও আলুজাতীয় ফসল ইঁদুর কেটে খায়, স্পষ্ট গর্ত করে এবং কেটে টুকরা টুকরা করে ফেলে। এভাবে ইঁদুর মাঠ ও গুদামে ও আলু ও মিষ্টিআলুতে ক্ষতি করে থাকে।

চিত্র-২০ ইঁদুর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ আলুর ক্ষেত ও আলু

চিত্র-২১: ইঁদুর দ্বারা আক্রান্ত মিষ্টিআলুর ক্ষেত ও ক্ষতিগ্রস্থ মিষ্টিআলু

সবজিতে ইঁদুরের ক্ষতির ধরণ

মিষ্টিকুমড়া, করলা, তরমুজ, বাঙি, লাউ, শশা, টমেটো ইত্যাদি সবজি ক্ষেতে ইঁদুর প্রথমে এলোমেলো ভাবে গর্ত করে মাটি উঠিয়ে ডিবি করে এবং গাছের লতা পাতা কেটে দেয় ও গর্তে নিয়ে জমা করে। পরবর্তী পর্যায়ে যখন গাছে ফল ধরলে ইঁদুর ফল কামড়িয়ে খেয়ে ক্ষত সৃষ্টি করে ও ফল পঁচে নষ্ট হয়ে যায় (চিত্র-২২ ও ২৩)। এভাবে ইঁদুর সবজি ক্ষেতে ক্ষতি করে থাকে। মাঠের কালো ইঁদুর সবজি ক্ষেতে প্রধানত বেশী ক্ষতি করে থাকে।

চিত্র-২২: ইঁদুর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ বাঙির ক্ষেত ও ক্ষতিগ্রস্থ বাঙি

চিত্র-২৩: ইঁদুর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ টমেটো ও মিষ্টিকুমড়া

মুরগীর খামারে ইঁদুর দ্বারা ক্ষতির ধরণ

সাধারণত: মাঠের কালো ইঁদুর মুরগীর খামারে বেশী ক্ষতি করে থাকে। তবে কোন কোন সময় গেছো ইঁদুরও ক্ষতি করে থাকে। প্রথমত: খামারের মেঝে ও পার্শে মাটিতে দুই একটি গর্ত করে মাটি উঠিয়ে মেঝে নষ্ট করে পরে গর্তের সংখ্যা বেড়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতি করে থাকে (চিত্র-২৪)। ইঁদুর মুরগীর খামারে ডিম খেয়ে, মুরগীর খাবার খেয়ে এবং কখনও কখনও বাচ্চা মুরগী খেয়ে ক্ষতি করে থাকে (চিত্র-২৫)। তবে ডিম ও মুরগীর খাবার খেয়ে এবং মেঝে গর্ত করে বেশী ক্ষতি করে থাকে। জরীপে দেখা গেছে ইঁদুর ১ টি মুরগীর খামারে বৎসরে প্রায় ১৮,০০০/- টাকা পর্যন্ত ক্ষতি করে থাকে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, যে খামার গুলি কাচা মাটি সংলগ্ন, এবং ছোট গ্রামীণ পরিবেশে অবস্থিত সে সমস্ত খামারে সাধারণত: বেশী ক্ষতি করে থাকে। অপরিষ্কার, অপরিছন্ন স্যাঁত সেঁতে স্থানের মুরগীর ফার্মে ইঁদুরের ক্ষতি বেশী পরিলক্ষিত হয়। ইঁদুর রাতেই বেশী ক্ষতি করে থাকে। গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া শ্রীপুর কালীগঞ্জ এলাকার মুরগীর খামারে বেশী ক্ষতি দেখা যায়।

চিত্র-২৪: মুরগীর খামারে ইঁদুরের ক্ষতির নমুনা

চিত্র-২৫: ইঁদুর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ মুরগির ডিম, বাচ্চা ও মুরগির খাবার

ল্যাবরেটরী ও গুদামে ইঁদুর দ্বারা ক্ষতির ধরণ

ছোট কালো ইঁদুর, গেছো ইঁদুর এবং নেংটি ইঁদুর প্রধানত গুদামে, ল্যারেটরীতে,অফিসে, বাসাবাড়ীতে, ক্ষতি করে থাকে। গুদামে বিভিন্ন শস্যের যেমন ধান, চাউল, গম, ডাল,আলু ইত্যাদির বস্তা কেটে ও শস্য খেয়ে ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রিক তার আসবাসপত্র ইত্যাদি কেটে ক্ষতি করে। নেংটি ইঁদুর বাসা বাড়ী ও ল্যাবরেটরীতে লেপতোষক, বই পুস্তক, কাগজ, ফাইল ইত্যাদি কেটে ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে (চিত্র-২৬)। ঢাকা জেলার সাভারের নামা বাজারের বিভিন্ন মুদীর দোকানে জরীপ করে দেখা গেছে ইঁদুর চাল, ডাল, আটা, গম, তরীতরকারী, বস্তা সহ আসবাসপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র কেটে ও খেয়ে ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। যার পরিমাণ বৎসরে প্রায় ১৬ কোটি টাকা। এভাবে ইঁদুর আমাদের খাদ্যশস্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নষ্ট করে আমাদের অর্থনীতিতে উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণ ক্ষতি সাধন করছে। গুদামে প্রতি পরিবারে ৪০-৫০ কেজি ধান বৎসরে ক্ষতি করে থাকে এবং এ ক্ষতির পরিমাণ ৭৫,০০০-১,০০,০০০ মেট্রিকটন।

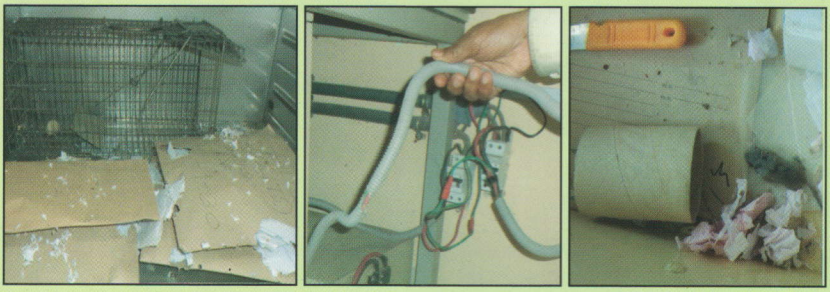

চিত্র–২৬: ইঁদুর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ল্যাবরেটরীর জিনিসপত্র ও বৈদ্যুতিক তার

ইঁদুরের উপস্থিতির চিহ্ন ঃ

ইঁদুরের উপস্থিতি নির্ণয়ের জন্য অনেক চিহ্ন আছে। এদের কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো-

ইঁদুরের পায়ের চিহ্ন (Foot prit)

কাদা মাটিতে, নরম বা বালি মাটিতে ইঁদুরের পায়ের ছাপ বোঝা যায়। তাছাড়া কালি মিশ্রিত টাইল এর উপর ও পায়ের ছাপ বুঝা যায়। পায়ের ছাপ বা চিহ্ন ইঁদুরের উপস্থিতি বুঝা যায় (চিত্র-২৭)।

ইঁদুরের চলাচলের রাস্তা (Runway)

অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় ইঁদুরেরও সচরাচর একই পথ দিয়ে চলাফেরা করে। তারা এই পথ সব সময়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। ফসলের জমিতে ফসলের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে তাদের সুড়ংগ পথ ৫-৬ সে. মি. ব্যাসার্ধের হয়ে থাকে (চিত্র-২৭)।]

চিত্র-২৭: ইঁদুরের চলাচলের রাস্তা ও পায়ের চিহ্ন

চিত্র-২৮: ইঁদুরের পায়খানা দ্বারা দূষিত ধান

চিত্র-২৯: ইঁদুরের সতেজ গর্ত

ইঁদুরের পায়খানা (Dropping)

ইঁদুরের বিষ্ঠা ফসলের ক্ষেতে, বাড়ীতে, দালান কোঠার বা গুদামে, গর্তের পার্শ্বে, দেয়াল মাচার উপর দেখতে পাওয়া যায়। ইঁদুরের প্রজাতির ভেদে বিষ্ঠার আকার ও আকৃতি ভিন্ন থাকে। ইঁদুর মলমূত্র দ্বারা গুদামের ধান, চাউল, গম, দূষিত করে (চিত্র-২৮)।

দাগ (Smear)

ইঁদুর সব সময় একই রাস্তা দিয়ে চলাচল করে। বার বার একই রাস্তা ব্যবহার করার ফ চলাচলে রাস্তার পার্শ্বে, বীম এ এক ধরণের দাগ দেখা যায়। দাগ দেখেও ইঁদুরের উপস্থিতি যায় (চিত্র-২৯) ।

ইঁদুরের গর্ত (Burrow)

ইঁদুরের গর্ত সাধারণত খাদ্য গুদামের নিকটে দেয়ালের বাহিরে স্থাপনার নীচে এবং বাধের প ফসলের ক্ষেতে দেখা যায়। সদ্য নুতন মাটি বা উঠানো গর্ত দেখে সহজেই সতেজ গর্ত সন করা যায় এবং ইদুরের উপস্থিতি সহজেই বুঝা যায় (চিত্র-২৯)।

ক্ষত এবং কাটাকুটির চিহ্ন (Damage)

মাঠে কাটা গাছ, কাটা ফল, শাকসবজি, গুদামে বা মাচাতে কাটা বস্তা ইত্যাদি দেখে ইঁদুরের উপস্থিতি বুঝা যায়। গম বা ধানের কান্ড তারা তেরছা/ কোনা করে কাটে।

শব্দ (Sound) ও ঘ্রান

ঘরে বাড়ীতে সাধারণত: রাতের বেলায় মাচা বা সিলিং এর উপর ইঁদুরের দৌড়ানো বা চলাফেরার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। ইঁদুরের কিচির মিচির শব্দ বা ইঁদুরের প্রশ্রাব পায়খানার গন্ধ শুকে ও ইঁদুরের উপস্থিতি বুঝা যায়।

ইঁদুর দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

ইঁদুর দমন পদ্ধতি সমূহকে আমরা সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। (ক) পরিবেশসম্মত ভাবে ইঁদুর দমন বা অরাসায়নিক পদ্ধতি (খ) বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে ইঁদুর দমন বা রাসায়নিক পদ্ধতিতে ইঁদুর দমন ।

সমন্বিত ইঁদুর দমন পদ্ধতি ঃ

ইঁদুর দমনের জন্য বেশ কয়েকটি পদ্ধতি আছে। যেমন - অরাসায়নিক, রাসায়নিক, জৈবিক নিয়ন্ত্রন, গ্যাস বড়ি, আঠা, পরভোজী প্রাণী ইত্যাদি। এ সব পদ্ধতি প্রয়োগ করে ইঁদুর দমনকে সমন্বিত দমন পদ্ধতি বলে।

ক) পরিবেশ সম্মতভাবে দমন ঃ কোন রকম বিষ ব্যবহার না করে অর্থাৎ পরিবেশের কোন ক্ষতি না করে ইঁদুর দমনই হলো পরিবেশ সম্মতভাবে ইঁদুর দমন বা অরাসায়নিক পদ্ধতি । বিভিন্ন ভাবে এটা করা যায়। যেমন-

পরিদর্শন ও সজাগ দৃষ্টির মাধ্যমে

ইঁদুর দমনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে সজাগ থাকা বা সতর্ক দৃষ্টি। যার অর্থ হচ্ছে ঘর বাড়ীতে বা ক্ষেত খামারে ইঁদুরের উপস্থিতি জানার জন্য প্রায়ই এবং নিয়মিত পরিদর্শন করা । ইঁদুর উপস্থিতির কোন চিহ্ন দেখা মাত্র তাকে খুঁজে বের করে যে কোন উপায়ে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করা উচিৎ। মাঠে ইঁদুরের উপস্থিতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং দেখা মাত্রই মারার ব্যবস্থা করতে হবে। কোথায় ফাঁদ পাততে হবে, অথবা কোন গুদাম বা ভান্ডার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে বা কোন গর্ত বন্ধ করতে হবে বা কোথায় কোন দরজা জানালা ঠিক করতে হবে ইত্যাদি তথ্য পরিদর্শনের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

নিবিড়ভাবে ফাঁদ পাতার মাধ্যমে ইঁদুর দমন ঃ

নিবিড়ভাবে বিভিন্ন রকমের জীবন্ত ও মরন ফাঁদ ব্যবহার করে ইঁদুর দমন করা যায় (চিত্র-৩০)। কোন কোন ফাঁদে ইঁদুর ধরা পড়ার সময়ই যাতাকলে আটকিয়ে মারা যায়। এগুলিকে মরণ ফাঁদ বলে। কোন কোন ফাঁদে (বাঁশের ফাঁদ, বাক্সে ফাঁদ, খাঁচার ফাঁদ ইঁদুর জীবন্ত ধরা হয় এ গুলিকে জীবন্ত ফাঁদ বলে (চিত্র-৩১)। ফাঁদে ইঁদুরকে আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের খাদ্য টোপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সহজে স্থানীয় ভাবে পাওয়া যায় এমন খাদ্যই টোপ হিসাবে ব্যবহার

করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ শুটকি মাছ, বিস্কুট, আলু, পাউরুটি ইত্যাদি (চিত্র-৩২)। ফাঁদে বা পুরুষ ইঁদুরের মুত্র, মল, গায়ের গন্ধযুক্ত টোপ ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। তাছ ফাঁদে ব্যবহৃত দ্রব্য যেমন বিস্কুট, নারিকেল, শুটকী মাছ এর সাথে কার্বন ডাই সালফাইড (০.১-৫ পি পি এম) মিশ্রিত টোপ হিসাবে দিলে ফাঁদে আটকানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় (৭০% সফলতা)। তাছাড়া টোপে ইঁদুরে মলমূত্র, পশম, ইত্যাদি ব্যবহার করলে আটকানে সফলতা বৃদ্ধি পায়।

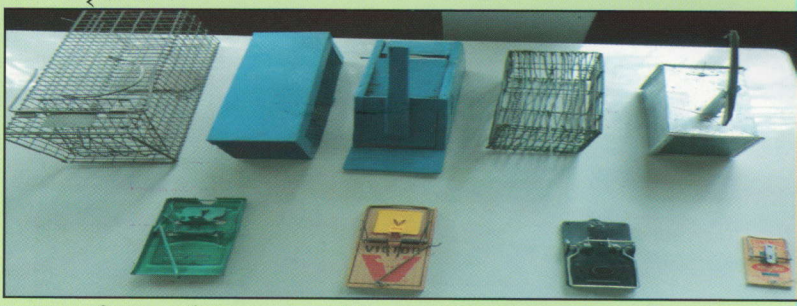

চিত্র - ৩০: ইঁদুর ধরা বা মারার বিভিন্ন ধরণের জীবন্ত (উপরে) ও মরণ (নীচে) ফাঁদ

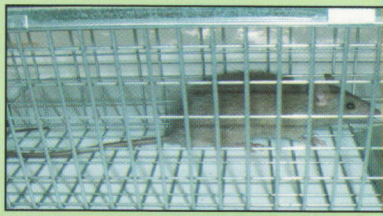

চিত্র–৩১: মরণ ফাঁদে আটকানো ইঁদুর ও জীবন্ত ফাঁদে আটকানো ইঁদুর

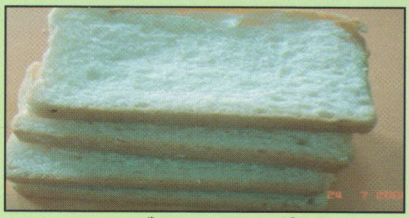

ফাঁদে ব্যবহৃত পারুটির টুকরা

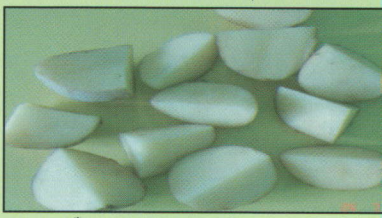

ফাঁদে ব্যবহৃত আলুর টুকরা

ফাঁদে ব্যবহৃত নারিকেলের ফালি

ফাঁদে ব্যবহৃত শুটকি মাছ

চিত্র-৩২ টোপ হিসাবে ফাঁদে ব্যবহৃত ইঁদুরের বিভিন্ন খাবার

ফাঁদ স্থাপনের কৌশল:

সাধারণত: যেখানে ইঁদুর দেখা যায় এবং যেখান দিয়ে ইঁদুর চলাফেরা করে যেমন ঘরের কিনারা, দেয়ালের পার্শ্ব, চালের উপর বা গর্তের কাছাকাছি সেখানে ফাঁদ স্থাপন করা উচিত। মরণ ফাঁদ ইঁদুর চলাচলের রাস্তায় আড়াআড়িভাবে দেয়ালের বিপরীতে পাতা উচিত কেন না তাতে দুই দিক হতে ইঁদুর ফাঁদে পড়ার সম্ভবনা থাকে। বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ ঘর বাড়ীর জন্য উপযোগী কিন্তু মাঠেও এ ধরনের ফাঁদ পাতা যায় (চিত্র-৩৩)।

চিত্র-৩৩: ফাঁদ স্থাপনের কৌশল:

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

যদি খাদ্য বস্তু বন্ধ পাত্রে এবং পরিচ্ছন্নভাবে রাখা যায় তবে ইঁদুরের আহার্যের অভাব হয় এবং সেখানে ইঁদুর কমই আসে। আবার যদি বাসস্থানের অভাব হয়, লুকানোর জায়গা না পায় তা হলে ইঁদুর অস্বস্তি অনুভব করবে এবং সে স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। সুতরাং, ভান্ডার, গুদাম, বা অন্যান্য জিনিস পত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও প্রত্যেক দিন ঘর ঝাড়ু দেয়া প্রয়োজন। ঘরে বা গুদামে ও পাত্রে যে কোন রকমের ছিদ্র বা গর্ত বন্ধ করে রাখা দরকার। মাঠে পরিত্যক্ত জমি অথবা ক্ষেতের আইলে অবস্থিত আবর্জনা সরিয়ে ফেলা যায়। কেননা ঐ সব আবর্জনা ইঁদুর আশ্রয় হিসাবে ব্যবহার করে। দুই ক্ষেতের মধ্যবর্তী আইল যতদুর সম্ভব সরু রাখতে হবে এবং অপ্রয়োজনীয় গাছ পালা পরিষ্কার রাখতে হবে। যতদুর সম্ভব ইঁদুরের বসবাসের নিজস্ব পরিবেশের ব্যাঘাত ঘটিয়ে তাদের থাকা, খাওয়া ও চলাফেরার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে হবে। যদি মাঠে ও ক্ষেতের আইল পরিষ্কার থাকে তবে ইঁদুরের সংখ্যা কমে যায়।

প্রতিবন্ধকতা : ধাতব পাত দ্বারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে ফল গাছে ইঁদুর দমন

নারিকেল গাছ সহ অন্যান্য গাছে ইঁদুর দমনের ক্ষেত্রে ধাতব পাত দ্বারা সাফল্যজনকভাবে ইঁদুর দমন করা যায়। এ ক্ষেত্রে টিনের পাত লাগানোর পূর্বে গাছকে ইঁদুর মুক্ত করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় মরা ডাল পালা কেটে পরিস্কার করতে হবে। এবং অন্য গাছের সাথে লেগে থাকা ডালপালা ছেটে দিতে হবে। বিশেষ করে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব কমপক্ষে ৫ ফুট বা ২ মিটার ব্যবধান হতে হবে। যাতে ইঁদুর অন্য গাছ থেকে ডাল বেয়ে টিন লাগানোর গাছে না আসতে পারে। নারিকেল, সুপারি গাছসহ ফল উৎপাদনকারী গাছের গোড়া হতে ২ মিটার উপরে গাছের খাড়া কান্ডের চারিদিকে টিনের পাত শক্তভাবে আটকিয়ে দিতে হয়। (চিত্র-৩৪) ফলে ইঁদুর গাছের গোড়া (নিচ) থেকে উপরে উঠতে যেয়ে টিনের পাত কিছুটা মসৃন হওয়ার বাধা প্রাপ্ত হয়ে ফসকে পড়ে যায় ফলে উপরে উঠতে পারেনা। ধাতব পাতটি ৪০-৫০ সে:মি: চওড়া হওয়া

দরকার ধাতব পাতের চওড়া নির্ভর করে গাছটির ব্যাসের পরিমাণের উপর। সাধারণত: নারিকেল গাছে ২.০-২.৫ মিটার লম্বা ধাতব পাতের প্রয়োজন হয়। ধাতব পাতটি রং করে নিলে মরিচা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় (চিত্র-৩৪)। এই পদ্ধতি অরাসায়নিক হওয়ায় পরিবেশ দূষণমুক্ত, অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়ী ও লাভজনক। সাধারণতঃ এ পদ্ধতি ব্যবহারে ১টি নারিকেল গাছে ১০০-১৫০ টাকা খরচ হয়। একবার টিনের পাত লাগালে ৪-৫ বৎসর পর্যন্ত কার্যকর থাকে। এ পদ্ধতি ব্যবহার করে নারিকেল সহ অন্যান্য ফল গাছে ইঁদুর ও কাঁঠবিড়ালী সফলভাবে দমন করা যায়।

চিত্র- ৩৪: ধাতব পাতের মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নারিকেল গাছে ইঁদুর দমন

গর্ত খোড়া, পানি ও ধোঁয়া দিয়ে ইঁদুর দমন

ইঁদুরের গর্ত খুড়ে পানি অথবা ধোঁয়া (মরিচ পুড়িয়ে শুখনো মরিচের ধোয়া দিয়ে) প্রবেশ করিয়ে ইঁদুর মারা যায়। যদি সম্ভব হয় তবে পানি বা ধোঁয়া প্রয়োগ করার সময় ইঁদুরের গর্তের মুখগুলি জাল দ্বারা ঢেকে দিলে ইঁদুর গর্ত থেকে বের হয়ে পালাতে পারে না। একসাথে অনেক লোক মিলে এই ব্যবস্থা নিলে ভাল ফল পাওয়া যায় (চিত্র-৩৫)।

চিত্র-৩৫: গর্ত খোড়া, পানি ও ধোঁয়া দিয়ে ইঁদুর দমন

জৈব নিয়ন্ত্রণ বা পরভোজী প্রাণীর মাধ্যমে ইঁদুর দমন

জীবিত কোনো প্রাণীকে অন্য কোনো জীবিত প্রাণী দ্বারা নিয়ন্ত্রণকেই জৈব নিয়ন্ত্রণ বলে। কিন্তু আজকাল অবৈধ শিকারীরা ঐ সমস্ত প্রাণী মেরে চামড়া বিদেশে পাচার করছে। ফলে প্রকৃতিতে ইঁদুরের সংখ্যা হ্রাস পাবার পরিবর্তে বেড়েই চলছে। এ সমস্ত উপকারী পরভোজী প্রাণী নিধন অবিলম্বে বন্ধ করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অন্যান্য প্রাণীর মত ইঁদুর জাতীয় প্রাণীরও পরভোজী প্রাণী আছে, তন্মধ্যে বিড়াল, বনবিড়াল, কুকুর, খেকশিয়াল, পাতিশিয়াল, বাজপাখী, চিল, পেঁচা, বেজী, সাপ, গুইসাপ ইত্যাদি প্রাণী ইঁদুর খায় (চিত্র-৩৬)। ঘরে যদি দু' একটা বিড়াল পোষা যায় তবে কার্যত: ঘরে ইঁদুর থাকে না। যদি এ সমস্ত প্রাণী মেরে ফেলা থেকে বিরত থাকা যায় তবে ইঁদুর দমনের সহায়ক হবে।

গুইসাপ

পেঁচা,

ঈগল

চিত্র-৩৬: ইঁদুর খেকো বিভিন্ন ধরনের প্রাণী

সতেজ গর্তে কাচা গোবরের মিশ্রণ দিয়ে ইঁদুর দমন

সতেজ গর্তে গোবরের মিশ্রন (২০-৩০%) দিয়েও গর্তের ইঁদুর দমন করা যায়। ইঁদুরের সতেজ গর্তে ২০০-৩০০ গ্রাম কাঁচা গোবর ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে ইঁদুরের গর্তে মিথেন গ্যাস সৃষ্টি হয় যার ফলে ইঁদুর গর্ত থেকে বের হয়ে যায় বা মারা যায় (চিত্র-৩৭)। এভাবে মাঠে, গুদামে ও পোলট্রি ফার্মে সফল ভাবে ইঁদুর দমন করা যায়। ইঁদুর দমন কর্মসূচীর মাধ্যমে কৃষক বা জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে ও একযোগে ইঁদুর মারার ব্যবস্থা নিতে হবে।

চিত্র-৩৭: সতেজ গর্তে কাঁচা গোবরের মিশ্রণ দিয়ে ইঁদুর দমন

বপন পদ্ধতি পরিবর্তনের মাধ্যমে

বপন পদ্ধতির উপর ইঁদুরের আক্রমন কমবেশী হয়ে থকে। যেমন গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, সারিতে বপন (৬-৮%) ছিটিয়ে বপনের চেয়ে (৮-১০%) ইঁদুরের আক্রমন কিছুটা কম হয় আবার বেড পদ্ধতিতে গম আবাদ করলে ইঁদুরের আক্রমন কম হয় (৩-৪%)।

আঠা (Rat glue) ব্যবহারের মাধ্যমে ইঁদুর দমন

ইঁদুর ধরার জন্য গুদামে বা ঘরে এক প্রকার আঠা সাধারণত কাঠবোর্ডে, মোটা শক্ত কাগজ, টি হার্ডবোড, প্লাষ্টিক টাইল (১০" x ১০") এ প্রলেপ দিয়ে চলাচলের রাস্তায় ব্যবহার করা হ কাঠবোর্ডের মাঝখানে কোনো প্রকার আঠা ব্যবহার করা হয় না, সেখানে লোভনীয় খাবার র হয় ইঁদুরকে আকৃষ্ট করার জন্য। খাবার খেতে এসে আঠার সংস্পর্শে ইঁদুররের গায়ের লে আটকে যায়, ফলে নড়াচড়া করতে পারে না। প্রয়োজন হলে ব্যবহৃত কাঠবোর্ডটিতে আরো অ যুক্ত করতে হবে। আঠা দ্বারা সাধারণতঃ গুদামে বাসাবাড়িতে গুদামে, লাবএ অফিস আদাল ইঁদুর দমন করা যায়। তবে মাঠেও ব্যবহার করা যেতে পারে। No Rat, Rat glue, All tr নামে এ ধরনের বিষমুক্ত আঠা ব্যবহার করা হয়ে থাকে যা বেশ কার্যকর ও বহুল প্রচলিত।

ইঁদুর খাবার অভ্যাস করে

কোনো কোনো দেশে ইঁদুরের মাংস খাবার প্রচলন আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ফিলিপাইনের কোনো কোনো এলাকায়, এমনকি বাংলাদেশের উপজাতীয় লোকজনও ইঁদু মাংস সুস্বাদু খাবার হিসেবে খেয়ে থাকে এবং ঐ সমস্ত এলাকায় ইঁদুরের সংখ্যা ও উপ অনেকটা কম বলে জানা গেছে।

আইন সৃষ্টির মাধ্যমে

কোনো অনুষ্ঠান করার পূর্বে (যেমন বিয়ে) নির্দিষ্ট সংখ্যক ইঁদুর মেরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ছাড় নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ধরনের ব্যবস্তা ইন্দোনেশিয়াতে প্রচলিত আছে।

ইঁদুরের লেজ সংগ্রহের মাধ্যমে

এ ব্যবস্থা ইতিমধ্যে কয়েকবার বাংলাদেশে নেয়া হয়েছে এবং আশানুরূপ ফলও পাওয়া গে প্রতিটি ইঁদুরের লেজের জন্য ২.০০ টাকা বা ৩.০০ টাকা প্রদানের মাধ্যমে লেজ সংগ্রহ অভি চালিয়ে ইঁদুরের সংখ্যা কমিয়ে রাখা সম্ভব। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রতি বছর এ ধরনের কর্মক ইঁদুর দমনের জন্য বাস্তবায়ন করে থাকে।

ইঁদুর দমন কর্মসূচীর মাধ্যমে

বছরে ২-৩ বার (বিভিন্ন ফসলের মৌসুমে) কর্মসূচী ঘোষণা করে এবং সে সময় বাজ ডিলারের মাধ্যমে বা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে ইঁদুরের বিভিন্ন প্রব ফাঁদ ও বিষটোপ ব্যবহার করে ইঁদুর দমনের সবগুলো পদ্ধতি প্রয়োগ করে সম্মিলিতভাবে ই দমন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে (চিত্র-৩৭ ও ৩৮)।

চিত্র–৩৮: কাপাসিয়ায় পোল্ট্রি ফার্মে জীবন্ত ফাঁদে আটকানো ইঁদুর

(খ) রাসায়নিক দমন বা ইঁদুরনাশক দিয়ে দমন

রাসায়নিক পদ্ধতিতে ইঁদুর দমন (Chemical Control Method) পৃথিবীর প্রায় সর্বএই বহু যুগ ধরে রাসায়নিক পদ্ধতিতে ইঁদুর দমন চলে আসছে। বিষ ক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে রাসায়নিক পদ্ধতিকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে, (ক) তীব্র বা তাৎক্ষণিক বিষ (Acute poison) (খ) বহুমাত্রা বা দীর্ঘমেয়াদী বিষ (Chronic poison)। বাংলাদেশে দুই ধরনের ইঁদুরনাশক পাওয়া যায়।

ক. তীব্র বা তাৎক্ষণিক বিষ (Acute poison)

যে সমস্ত বিষ খেলে ইঁদুরের দেহেজ তাৎক্ষণিক বিষক্রিয়া দেখা দেয় এবং মৃত্যু ঘটায় তাদেরকে তীব্র বিষ বলা হয়। যেমন- জিংক ফসফাইড, আন্টু, থেলিয়াম সালফেট, রেডস্কুইল, নরব্রোমাইড, বেরিয়াম কার্বনেট, আরসেনিক ট্রাইঅক্সাইড, ব্রোমেথিলিন ইত্যাদি। একমাত্র 'জিংক ফসফাইড' সরকার অনুমোদিত একমাত্রা বা তাৎক্ষণিক বা তীব্র বিষ। এ ধরনের বিষটোপ ইঁদুরের পাকস্থলীতে এসিডের সংস্পর্শে এসে এক প্রকার বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি করে। এ গ্যাস লিভার ও কিডনীকে অকেজো করে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ করে ইঁদুরের মৃত্যু ঘটায়।

বিষটোপ তৈরিও খুব সহজ। তাই অতি সহজে কৃষক ভাইরা জিংক ফসফাইড দিয়ে বিষটোপ তৈরি করে এবং তা দিয়ে ইঁদুর দমন করে। এই বিষ থেকে তৈরি বিষটোপ খেয়ে ইঁদুর সাথে সাথেই মারা যায়। ইঁদুর মরা অবস্থায় বিষটোপ পাত্রের আশেপাশেই পড়ে থাকতে দেখা যায় বলে অনেকেই এই বিষটোপ খুব পছন্দ করে। কিন্তু এই বিষটোপের প্রধান অসুবিধা হলো বিষটোপ লাজুকতা। অর্থাৎ মরা ইঁদুর পড়ে থাকতে দেখে অন্য ইঁদুর আর বিষটোপ খেতে চায় না। একেই বিভটোপ লাজুকতা বলে। বিষটোপ ব্যবহারের পূর্বে ২-৩ দিন বিষহীন টোপ ব্যবহার করে ইঁদুরকে টোপ খেতে অভ্যস্ত করে নিলে ইঁদুরের মৃত্যুর হার অনেক বেড়ে যায়। তবে কোনো ক্রমেই পর পর দু' তিন রাত বিষটোপ ব্যবহারের পর ঐ স্থানে এক মাস আর এ বিষ ব্যবহার করাই ভাল।

জিংক ফসফাইড (২%)বিষটোপ তৈরির পদ্ধতি (চিত্র-৩৯-৪০)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণী বিভাগ
ফরমুলেশনকৃত জিংক ফসফাইড (২%) বিষটোপ দিয়ে সাফল্যজনক ভাবে গর্তের ইঁদুর
করা যায়। বিষটোপ তৈরীও খুব সহজ। বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত গমে আবরনযুক্ত ২%
ফসফাইড বিষটোপ একটি অত্যন্ত কার্যকরী ইঁদুরনাশক। বিষটোপ তৈরির পদ্ধতি হলো এ
এ্যলুমিনিয়ামের পাত্রে ১০০ মিলিলিটার পানির মধ্যে ১০ গ্রাম সাগু বা বার্লি মিশিয়ে
দেওয়ার পর যখন পানি ঘন আঁঠাল হয়ে আসবে তখন পাত্রটি নামিয়ে ঠান্ডা করে ২৫ গ্রাম
ফসফাইড (২%) তার সাথে ভালভাবে মিশিয়ে ৯৬৫ গ্রাম গম ঢেলে দিতে হবে। প
ভিতরে গম নেড়ে চেড়ে এমন ভাবে মিশাতে হবে যেন সমস্ত গমের গায়ে কাল আবরণ প
পাত্রের মধ্যে জিংক ফসফাইড মিশানো সাগু বা বার্লি অবশিষ্ট না থাকে। এর পর মিশ্রিত গ
থেকে ৪ ঘন্টা রোদে শুকিয়ে ঠান্ডা করে বায়ু রোধক পাত্রে রেখে দিতে হবে। পরে সেখান
নিয়ে প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে হবে। এ বিষটোপ পর পর দুই থেকে তিন দিনের
ব্যবহার না করাই ভালো কারণ পরবর্তীতে বিষটোপ লাজুকতা দেখা দিতে পারে।

চিত্র-৩৯: জিংক ফসফাইড (২%)বিষটোপ তৈরির উপকরণ (গম, বার্লি, পানি, জিংক ফসফাইড (২%),দিয়াশলাই, চামিচ ইত

চিত্র-৪০: জিংক ফসফাইড(২%) বিষটোপ

চিত্র-৪১: গর্তের ভিতরে জিংক ফসফাইড বিষটোপ প্রয়োগ

বিষটোপ প্রয়োগ পদ্ধতি

বাসাবাড়ি, গুদাম, ও ল্যাবরেটরীতে, এবং ফসলের মাঠে এই পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যায়। মাঠে যেখানে ইঁদুরের উপস্থিতি বুঝা যায় সেখানে বা ইঁদুর চলাচলের রাস্তায় বা সতেজ গর্তের আশেপাশে জিংক ফসফাইড বিষটোপ কোন পাত্রে রেখে দিতে হবে (চিত্র-৪২)। জমির উপর এই ভাবে বিষটোপ দিয়ে ইঁদুর দমন করা একটি বড় সমস্যা হল প্রায়ই ইঁদুর এই বিষটোপ খেতে চায় না এবং বৃষ্টি বাদলের দিনে ভিজে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি যার ফলে ইঁদুর দমনে কাংখিত সফলতা আসে না। বিশেষ করে গম বা ধান ক্ষেতে যখন ইঁদুরের আক্রমণ হয় তখন পাকা গম বা ধান না খেয়ে বিষটোপ খাবার সম্ভাবনা খুব কম। তাই জমির উপরে বিষটোপ না দিয়ে ৩-৪ গ্রাম বা ৮-১০ টি বিষমাখা (জিংক ফসফাইড) গম ৮ x ৬ (সে.মি.) আকারের একটি কাগজ দিয়ে পুটলি বেঁধে সতেজ গর্তের মুখ পরিষ্কার করে গর্তের ভিতর ঢুকিয়ে দিতে হবে। গর্তের ভিতর কাগজের পুটলিটি এমনভাবে নিক্ষেপ করতে হবে যেন গর্তের মুখ থেকে আনুমানিক ৮-১০ ইঞ্চি ভিতরে যায় (চিত্র-৪১.)। প্রয়োজনে একটি ছোট কাঠি দিয়ে গর্তের ভিতরে ঠেলে দেয়া যেতে পারে। তবে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে কাগজটি যেন কখনো মাটির নীচে চাপা না পড়ে। এরপর গর্তের মুখ হালকাভাবে মাটি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে (চিত্র-৪১)।

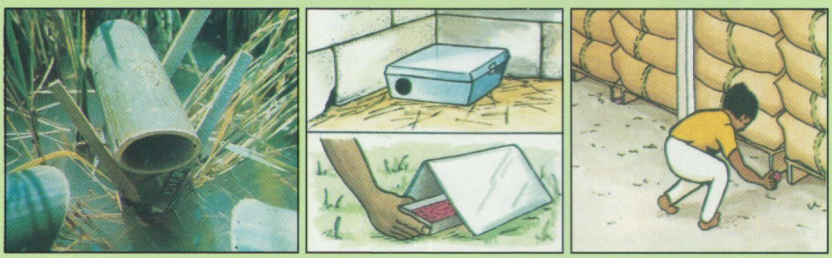

চিত্র-৪২: বিষটোপ প্রয়োগ পদ্ধতি

এভাবে বিষটোপ প্রয়োগের সুবিধা হলো (১) এই বিষটোপ ইঁদুর বেশী খায় (২) অন্য কোন প্রাণী যেমন প্রাখী, বিড়াল, কুকুর বা অন্যান্য পোষা প্রাণী এই বিষটোপ খেতে পারেনা। এতে অপ্রত্যাশিত প্রাণীর মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকেনা। তাছাড়া পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনাও খুব কম। মৃত ইঁদুর গর্তের ভিতর থাকে বলে মৃত ইঁদুর খেয়ে কাক, চিল ও বিড়াল মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা। এই পদ্ধতির সফলতা প্রায় ২৫% বেশি। তাছাড়া কৃষক ভাইদের তেমন কোন বাড়তি খরচ নেই। তাই গর্তের ভিতরের ইঁদুর সফলভাবে দমনের জন্য এই পদ্ধতি বেশ লাভজনক হওয়ায় কৃষকরা সহজেই এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন।

(খ) দীর্ঘমেয়াদী বিষ (Chronic poison)

যে সমস্ত বিষ খেলে ইঁদুর তাৎক্ষণিকভাবে বিষক্রিয়ায় মারা না গেলেও ধীরে ধীরে অসুস্থ বা হয়ে ২-১৪ দিনের মধ্যে মারা যায় তাদেরকে দীর্ঘমেয়াদী বিষ বলা হয়। দীর্ঘমেয়াদী বি দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (ক) একমাত্রা বিষ, (খ) বহুমাত্রা বিষ। একমাত্রা একবার খে ইঁদুর মারা যাবে, যেমনঃ ক্লেরাট, স্টর্ম। বহুমাত্রা বিষ খেয়ে ইঁদুর মরার জন্য একাধিব খেতে হবে যেমন: ল্যানির‍্যাট (চিত্র-৪৩), ব্রোমাপয়েন্ট, রেকুমিন। উল্লিখিত সবগুলো বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত। সকল দীর্ঘমেয়াদী বিষই রক্তজমাট বাধার ক্ষমত ব্যাহত করে প্রধানত শরীরের ভিতরে বা বাইরে অনবরত রক্তক্ষরণের মাধ্যমে ইঁদুর দুর্বল মারা যায়। এ ধরনের বিষ যকৃতে ভিটামিন কে-১ তৈরিতে বাধাগ্রস্ত করে। ভিটামিন কে-১ জমাট বাধার উপাদান (যা সম্মিলিতভাবে প্রোথ্রম্বিন নামে পরিচিতি) সৃষ্টিতে অপরিহ দীর্ঘমেয়াদী বিষ ভিটামিন কে-১ সৃষ্টিতে বাধা প্রদান করে রক্তের পোথ্রম্বিনকে ধীরে ধীরে কি রক্তজমাট বাধার প্রক্রিয়াকে নষ্ট করে ফেলে। ফলে অনবরত রক্তক্ষরণ হয়। বিষ খাও পরিমাণের উপর নির্ভর করে ইঁদুর মরতে ২ থেকে ১৪ দিন সময় লেগে থাকে। ইঁদুর এ ধর বিষ খেয়ে আস্তে আস্তে অসুস্থ হয়ে গর্তের ভিতর মারা যায়, সেজন্য মৃত ইঁদুর সচরাচর পড়ে না। এ ধরনের বিষ খেলে সহসা কোনো আক্রান্ত লক্ষণ ধরা পড়ে না বিধায় পরিবা অন্যান্য ইঁদুররাও এ ধরনের বিষটোপ খেতে কোনো কুণ্ঠা/দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। ফলে একস অনেক ইঁদুর মারা যাবার সম্ভাবনা থাকে। এ ধরনের বিষটোপে বিষটোপ লাজুকতা দেখা না। পরীক্ষামূলকভাবে মাঠে এ জাতীয় বিষ দ্বারা শতকরা নব্বই ভাগ ইঁদুর মারা সম্ভব। এ ল্যানিরটি বা ক্লেরাট, ব্রোমাপয়েন্ট নামে বিভিন্ন কীটনশকের দোকানে পাওয়া যায়।

চিত্র-৪৩: লানির‍্যাট বিষটোপ

চিত্র-৪৪: এ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড ট্যাবলেট(গ্যাস বড়ি)

দীর্ঘমেয়াদী বিষটোপ প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

দীর্ঘমেয়াদী বিষটোপ উপর্যুপরি বেশ কয়েকদিন ব্যবহার করতে হবে। এ ধরনের বিষটোপ বৃষ্টিতে বা মাটির আর্দ্রতায় কার্যক্ষমতা হারিয়ে না ফেলে সেজন্য সাধারণত কোনো পাত্রে রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পাত্রে সাধারণত ২০০-৩০০ গ্রাম বিষটোপ রাখতে হবে এ প্রতিদিনই পর্যবেক্ষণ করতে হবে বিষটোপ ইঁদুরে খেল কিনা, যদি খেয়ে থাকে তবে আবা বিষটোপ ঐ পাত্রে দিতে হবে যেন ইঁদুর তার প্রয়োজন মতো বিষটোপ খেতে পারে। এতে যদি

সময় বেশি লাগে তবুও ইঁদুর দমনে ভাল ফল পাওয়া যাবে। বিষটোপসহ পাত্রগুলো ইঁদুরের গর্তের কাছাকাছি বা যে সমস্ত জায়গায় ইঁদুরের উপস্থিতি এবং আনাগোনা আছে সেখানে রাখতে হবে। যে সব ক্ষেতে গর্তের মুখে নতুন মাটি তোলা দেখা যায়, সে সব গর্তের ভিতর বা আশে পাশে কোন পাত্রে বিষটোপ প্রয়োগ করতে হবে। তবে স্টর্ম সতেজ গর্তের মুখ পরিষ্কার করে একটি ব্লক গর্তের ভিতরে দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিয়েও ভাল ফল পাওয়া গেছে।

গ্যাসবড়ি দিয়ে ইঁদুর দমন

বিষটোপ ছাড়া এক প্রকার গ্যাস বড়ি দিয়েও ইঁদুর দমন করা যায়। যেমন-এ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড ট্যাবলেট। এই ট্যাবলেট বাজারে ফসটক্সি, কুইকফিউম, কুইকফস, সেলফস, ডিসিয়া গ্যাস এক্টি, এলুমফস, এগ্রিফস, গ্যাসটক্সি নামে পরিচিত। ইঁদুর আছে এমন গর্তের মুখের মাটি সরিয়ে প্রতিটি সতেজ গর্তের ভিতর একটি করে বড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে গর্তের মুখ ভালভাবে বন্ধ করে দিতে হবে। (চিত্র-৪৪) বড়ি গর্তের ভিতর ভেজা মাটির সংস্পর্শে এলে এক প্রকার বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়। এই গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে ইঁদুর মারা যায়। গর্তের মুখসহ আশে পাশের অন্যান্য গর্তগুলো ভালভাবে বন্ধ করে দিতে হবে যাতে গ্যাস বের হতে না পারে। বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে ইঁদুর গর্তের ভিতর মারা যায়। এই পদ্ধতিতে ও মাঠের গর্তের ইঁদুর দমন করা যায়।

সতর্কতা

জিংক ফসফাইড বিষটোপ তৈরীর সময় কাপড় দিয়ে নাক ঢেকে দিতে হবে। বিষটোপ তৈরীর পরও ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে ভালভাবে হাত ধুতে হবে। ছোট শিশু ও বাড়ির গৃহপালিত পশু পাখি যেন এই বিষটোপের সংস্পর্শে না আসে তা লক্ষ্য রাখতে হবে। মৃত ইঁদুরগুলি একত্রিত করে গর্তে পুতে ফেলতে হবে। বিষটোপ প্রস্তুত ও প্রয়োগে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং কোন রকম অসুস্থতা অনুভব করলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। গ্যাস বড়ি ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

ইঁদুর মানুষের ব্যক্তিগত ও জাতীয় সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। ইসলাম ধর্মমতে 'ইঁদুর মারা পূণ্যের কাজ'। আদিকাল থেকে মানুষ এদের দমনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু বেশির ভাগ ইঁদুর গর্তে বাস করে বলে সম্পূর্ণভাবে দমন বা নির্মূল করা সম্ভব হয় না। তাই এদের সংখ্যা কমিয়ে মূল্যবান ফসল রক্ষা করে খাদ্যাভাব দূর করার চেষ্টা করতে হবে। কোন নির্দিষ্ট একক পদ্ধতি ইঁদুর দমনের জন্য যথেষ্ট নয়। ইঁদুর দমনের সফলতা নির্ভর করে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং বিভিন্ন সময়োপযোগী পদ্ধতি ব্যবহারের উপর। অতএব সম্মিলিত এবং সময়োপযোগী দমন পদ্ধতি প্রয়োগ করলেই জমিতে ইঁদুরের উপদ্রব কমানো সম্ভব।

ইঁদুর সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

১. মানুষের প্রতিকূল বা স্বার্থের বিরুদ্ধে যে সকল মেরুদন্ডী প্রাণী ফসল, ফলফলাদি, শ
সবজি, তরিতরকারি, গৃহপালিত পশু পাখি, ঘরের আসবাবপত্র ইত্যাদির ক্ষতি ক
তাদেরকে ক্ষতিকর মেরুদন্ডী প্রাণী বলে। এদের মধ্যে ইঁদুর জাতীয় প্রাণী, পাখি, বাদ
বন্যপ্রাণী অন্যতম।

২. বাংলাদেশ ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর মধ্যে ইঁদুর, কাঠঁবিড়াল ও সজারুই প্রধান।

৩. ইঁদুর স্তন্যপায়ী, সর্বভুক ও নিশাচর প্রাণী।

৪. সারা বিশ্বে ইঁদুর জাতীয় প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ১,৭০০।

৫. এ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ১১ প্রজাতির ইঁদুর সনাক্ত করা হয়েছে।

৬. ইঁদুর মানুষের প্রধান শত্রু এবং মানুষের সাথে সহ-অবস্থান করেই ক্ষতি করে থাকে।

৭. ইঁদুর ঘরে, মাঠে, গুদামে সর্বত্রই ক্ষতি করে। সন্ধ্যায় এদের উপদ্রব শুরু হয়।

৮. ইঁদুরের মুখের সন্মুখভাগে উপরের ও নিচের মাড়ীতে একজোড়া করে কর্তন দন্ত ক্রমা
বৃদ্ধি পায়, তাই দাঁতের সামঞ্জস্যতা বজায় রাখতে সর্বদা কাটা কাটি করে।

৯. ইঁদুরের দাঁত সাধারণত ১৬ টি। এদের প্রিমুলার ও কেনাইন দাঁত নাই।

১০. ইঁদুর নিজের জিহ্বা দিয়ে চেটে ও পায়ের আঙ্গুল দিয়ে নিজের দেহ পরিষ্কার রাখে।

১১. ইঁদুর ঘরে বা গুদামে দেয়াল ঘেঁষে ও মাঠে নিজেদের তৈরী রাস্তায় চলাফেরা করে।

১২. একটি ইঁদুর বছরে প্রায় ৫০ কেজি গোলাজাত ফসল নষ্ট করতে পারে।

১৩. ইঁদুর যতটা খায় তার থেকে ৪-৫ গুন বেশী নষ্ট করে গর্তে নিয়ে, মাটিতে মিশিয়ে, প
পায়খানা, প্রস্রাব ইত্যাদি দিয়ে ।

১৪. ইঁদুর পুষ্টিকর এবং টাটকা খাবার বেশি পছন্দ করে। গর্ভাবস্থায় ইঁদুর বেশি খায়। স
ও ভোর রাতে খাবার বেশি খায় এবং ইঁদুর শরীরের ওজনের এক দশমাংশ খাবার খায়

১৫. একটি ইঁদুর বছরে খাবার খায় প্রায় ৮ থেকে ১০ কেজি, প্রস্রাব করে ৫ লিটার, পায়
করে ১৫,০০০ বার, যার ওজন প্রায় ২ কেজি ও গায়ের পশম ঝরে পড়ে ৫ লাখের মতে

১৬. প্রজাতি ভেদে ইঁদুর তরিতরকারিসহ নানা ধরনের ফলমূলেরও ক্ষতি করে।

১৭. ইঁদুর টেলিফোনের তার কেটে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে, বৈদ্যুতিক তার কেটে অগ্নি
ঘটায়। মূল্যবান আসবাবপত্র, কাপড় চোপড়, বই পুস্তক ইত্যাদি কেটে নষ্ট করে থাকে

১৮. রাস্তাঘাট, সড়ক, রেলপথ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ধ্বসে যাওয়ার জন্য প্রধানত ইঁদুরই দা

১৯. ইঁদুরকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি মাটির নিচে গর্তে বাস করে। যাদের
মাথাও শরীরের তুলনায় ছোট। অন্যটি মাটির উপরে ঘরে বা গাছে বাস করে, য
লেজ, মাথা ও শরীরের তুলনায় লম্বা।

২০. একটি সতেজ গর্তে একটি পূর্ণ বয়স্ক ইঁদুর বাস করে। তার আশে পাশে অনেক পু
গর্ত থাকে। তবে প্রজননের সময় পুরুষ ও স্ত্রী ২ টি পূর্ণ বয়স্ক ইঁদুর স্বল্প সময়ের
একই গর্তে দেখা যায়।

২১. ইঁদুর গর্তে ২০ কেজিরও বেশি খাবার নিয়ে জমা করতে পারে।

২২. মাটিতে ইঁদুরের গর্ত ৫০ মিটার লম্বা এবং গভীরতায় ১ মিটার হতে পারে।

২৩. ইঁদুর রঙের পার্থক্য বুঝতে পারেনা। তবে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলো খুবই প্রখর। একটু শব্দ হলেই বুঝতে পারে বা ঘ্রাণ দ্বারা সহজেই খাবারের উপস্থিতি খুঁজে পায়।
২৪. ইঁদুর সহজেই নতুন খাবার গ্রহন করতে চায়না এবং সামান্য বিষাক্ত জিনিসও বুঝতে পারে।
২৫. কোনো কোনো প্রজাতির ইঁদুর সাঁতারে খুব পটু।
২৬. ইঁদুর সর্বদাই তেরছা বা কোনাকুনি ভাবে, (৩০-৪৫ ডিগ্রি কোণে) ফসল কাটে।
২৭. ইঁদুর পায়খানার পাইপ বেয়ে সহজেই বহুতলা বিশিষ্ট দালানের উপরে উঠতে পারে।
২৮. ইদুর ঘরে বা গুদামে ভাঙ্গা মেঝে, দেয়ালের ফাটল, দরজার নিচ বা জানালার ছিদ্র ইত্যাদি দিয়ে, পাইপ বেয়ে বা পাইপ সংযোগের ফাঁকা বা ভাঙ্গা অংশ দিয়ে ঢুকতে পারে।
২৯. ইঁদুর লাফিয়ে ০.৫ মিটার উপরে এবং সামনের দিকে ১.০-১.৫ মিটার পর্যন্ত যেতে পারে। ১০ মিটার উপর থেকে পড়লেও ইঁদুরের তেমন ক্ষতি হয়না।
৩০. ইঁদুর তার বেয়ে লম্বালম্বি ও খাড়া উভয় দিকেই চলাচল করতে পারে।
৩১. ইঁদুর মরুভূমি ও হিমাগার ও পাহাড়ের চূড়াসহ যেকোনো আবহাওয়ায় বা পরিবেশে বাস করতে পারে।
৩২. ইঁদুর প্লেগসহ প্রায় ৪০ প্রকার রোগ ছড়াতে সাহায্য করে।
৩৩. ইঁদুর মাঠে ১ থেকে ২ বছর ও গবেষণাগারে ২ থেকে ৩ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে।
৩৪. একজোড়া ইঁদুর থেকে বছরে ৫০০ টি এবং সর্বোচ্চ ৩,০০০ টি ইঁদুর জন্ম লাভ করতে পারে।
৩৫. ইঁদুরের গর্ভধারণ কাল প্রজাতি ভেদে ১৮ থেকে ২২ দিন।
৩৬. ইঁদুর সাধারণত বছরে ৬ থেকে ৮ বার বাচ্চা দেয়। প্রতিবারে ৩ থেকে ১৩ টি বাচ্চা দিতে পারে এবং জন্মের ১৬ থেকে ১৮ দিনের মধ্যে বাচ্চাদের চোখ ফোঁটে।
৩৭. বাচ্চারা ৩ সপ্তাহ পরেই শক্ত খাবার খেতে ও পানি পান পান করতে পারে।
৩৮. বাচ্চা প্রসবের ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই ইঁদুর আবার গর্ভধারণ করতে পারে।
৩৯. বাচ্চারা ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত মায়ের দুধ খায়ও পরে আলাদা হয়ে যায়।
৪০. তিন মাসের মধ্যেই বাচ্চা ইঁদুর পূর্ণ বয়স্ক হয়ে বাচ্চা দিতে সক্ষম হয়।
৪১. ইঁদুর খাদ্যাভাবে তার গর্ভের বাচ্চার সংখ্যা গর্ভে সুপ্ত অবস্থায় জীবিত রেখে কম সংখ্যায় প্রসব করার ক্ষমতা রাখে।
৪২. যে সব প্রাণীর মুখের অগ্রভাগে খুব শক্ত, তীক্ষ্ণ ও ধারালো এক জোড়া করে উপরে ও নীচে ছেদন দন্ত আছে যা অমৃত্যু পর্যন্ত বাড়তে থাকে তাদেরকে ইঁদুর জাতীয় প্রাণী বা রোডেন্ট বলে।
৪৩. সিলিং- এ চলাচল বা চিচি শব্দ, কোনো কিছু কাটার শব্দ, কাটা দ্রব্য বা ফসল বা ক্ষতির চিহ্ন, মলমূত্র, পায়ের ছাপ, চলাচলের রাস্তা, ইঁদুর জনিত দুর্গন্ধ, বাসা, গর্ত ইত্যাদি দেখে ইঁদুরের উপস্থিতি বুঝা যায়।
৪৪. ইঁদুরের আবাসিক এলাকা গর্ত থেকে ৫০ মিটারের বেশি নয়, তবে সাধারণত ২০-২৫ মিটার।

৪৫. ইঁদুর খাদ্যে ভাগ বসায়, অপচয় করে, ঘর-বাড়িতে এবং জমিতে ফসলের ক্ষতি ফলফলাদী, তরিতরকারি, গুদামজাত শস্য, কলকারখানার যন্ত্রপাতী নষ্ট করে, ছড়িয়ে খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করে যা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে, কাপড় আসবাবপত্র, বই পুস্তক কেটে নষ্ট করে এবং মারাত্মক রোগ জীবাণু বহন করে।

৪৬. ইঁদুরের উপস্থিতি বুঝা মাত্রই দমন ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

৫৭. ইঁদুর দমনের উপযুক্ত সময়- বর্ষাকাল, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে যখন ইঁদুর বাড়ি, বা উঁচু স্থানে আশ্রয় নেয়। ফসলে থোড় আসার আগে বা যখন ইঁদুরের সংখ্যা কম

৫৮. ইঁদুর জাতীয় প্রাণী (Rodent) কে নিধন করার রাসায়নিক দ্রব্য বা ঔষধকে ইঁদুর ন রডেন্টিসাইড (Rodenticide) বলে।

৪৯. ইঁদুর মানব কল্যাণে গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হয়। উপজাতীয়রা ইঁদুরের মাংস এদের চামড়া দিয়ে সৌখিন দ্রব্য তৈরি হয়। তবুও উপকারের তুলনায় ক্ষতির অনেক বেশি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

পুস্তিকাটি তৈয়ারীতে যারা অবদান রেখেছেন তাদের প্রতি কৃজ্ঞতা স্বীকার করছি

ড. মোঃ ইমদাদুল হক, প্রাক্তন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি, গাজীপুর
মোঃ জালাল উদ্দিন, সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর
মোঃ মাহতাব মিঞা, এল এ
মোসাঃ স্বপ্না খাতুন, কম্পিউটার অপারেটর
বিএআরআই গবেষণা ও গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প
এবং অত্র বিভাগের সকল কর্মচারী ও শ্রমিকবৃন্দ।

অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণী বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১